তারিখঃ ২১/০৯/২০২০

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও অপুষ্টি নিরসনে পুষ্টিকর ধান

সম্পাদকীয় ডেস্ক | প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

কৃষিবিদ এম আব্দুল মোমিন

বাংলাদেশে ক্ষুধা নিয়ে আপাতত কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু চিন্তা এখন অদৃশ্য ক্ষুধা (Hidden Hunger) বা অপুষ্টিকে ঘিরে। ক্ষুধা নিবারণে আমাদের দেশের কৃষকরা প্রতিবছর প্রায় চার কোটি মেট্রিক টন দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদন করছেন, অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও এটা আমাদের বিশাল সাফল্য। কিন্তু খাদ্য হিসেবে আমাদের শুধু কার্বহাইড্রেট বা শর্করা খেলে তো হবে না, আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্য বলতে আমরা বুঝি শর্করা, আমিষ, স্নেহ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি সবকিছুর সম্মিলন। সুস্থ্য ও নিরোগ থাকার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ আর্থিক অস্বচ্ছলতা বা সচেতনতার অভাবে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার যেমন-মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলা, আঙুর, আপেল ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারে না বা পরিমাণে কম গ্রহণ করছেন। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা মেটানো সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নলালিত সোনার বাংলা বিশ্ব দরবারে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নিম্নমধ্য আয়ের দেশ। আগামী ২০৪১ সালে বিশ্বে উন্নত দেশে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজির উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রচিত ১৯৭২ সালের সংবিধানে নাগরিকের পুষ্টি উন্নয়নকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭২ এর সংবিধানে উল্লেখ করা হয় “জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে”।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা এবং এসডিজির ২নং অভীষ্ট অর্জনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন- জিংক, আয়রন, প্রোটিন, মিনারেলসহ শরীরের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানগুলো দেহের প্রয়োজন অনুসারে চালে সংযোজন, সরবরাহ বা পরিমাণে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবনে বিশ্বের সর্বাধুনিক বায়োফর্টিফিকেশন ও জিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি এবং সরকারের নানামুখী ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে দেশে বিগত ১২ বছরে (২০০৯-২০) চালের উৎপাদন ৬.০০ লক্ষ টন হারে বেড়েছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত আছে। সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্রি ইতোমধ্যে “রাইস ভিশন ২০৫০” প্রণয়ন করেছে। রাইস ভিশনে যে প্রক্ষেপন করা হয়েছে তাতে দেখানো হয়েছে উৎপাদনের বর্তমান গতিশীলতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে চালের উৎপাদন হবে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ এবং ৪৭ মিলিয়ন টন। বিপরীতে ২০৩০, ২০৪১ এবং ২০৫০ সালে যথাক্রমে ১৮৬, ২০৩ এবং ২১৫ মিলিয়ন লোকের খাদ্য চাহিদা পূরণে চাল প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ৩৮.৫০, ৪২ এবং ৪৪.৬ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ বর্তমানের ন্যায় সামনের দিনগুলোতেও চাহিদা মিটিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েই ব্রির গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ইউএনপিডির একটি গবেষণায় বলা হচ্ছে, ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.৮৫ ভাগ এবং ২০১৯ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১.১৯ ভাগে। এই হিসেবে বাংলাদেশে ২০৫০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২১ কোটি ৫৪ লাখ এবং স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী ২০৭১ সালে ২৪ কোটি ২৮ লাখে এসে স্থিতিশীল হবে। সর্বোপরি ২৫ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা নিশ্চিত করার চিন্তা মাথায় রেখে বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। অন্য পুষ্টিকর খাবার যোগাড় করতে না পারলেও দু বা তিন বেলা ভাতের সংস্থান প্রায় সকলেরই সামর্থ্যের মধ্যে। সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, প্রতি ১০০ গ্রাম চালে মোটামুটি ১২৯ কিলোক্যালরি শক্তি, ৭৮.০৯ গ্রাম শর্করা, ৭.১২ গ্রাম প্রোটিন, ০.২৮ গ্রাম চর্বি, ১.৩০ গ্রাম আঁশ ০.০৭ মি.গ্রাম থায়ামিন, ০.০১৫ মি. গ্রাম রিভোপ্লাবিন, ১.০৯মি. গ্রাম জিংক, ২৮ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.৮০ মি. গ্রাম আয়রন, ২৫ মি. গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপোদান থাকে (ইউএসএইড পুষ্টি ডেটাবেজ)। বাংলাদেশে মাথাপিছু চালের গ্রহণ হার হিসেবে মোটামুটি দৈনিক যে পরিমাণে পুষ্টি আমরা চাল বা ভাত থেকে পাই তা কোনোভাবেই আমাদের চাহিদার সমান নয়। এ কারণে খাদ্যের চাহিদা মিটলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশে ৫ বছরের কমবয়সী শিশুর প্রায় দু-তৃতীয়াংশই কোনো না কোনো মাত্রার অপুষ্টিতে ভুগছে, এর মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ শিশু ভুগছে মারাত্মক অপুষ্টিতে। এর কারণ পুষ্টি সচেতনতার অভাব অথবা পুষ্টিকর খাবার ক্রয় করার অসামর্থ্যতা।

এটি বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন ভাতে কিভাবে শরীরের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপোদানগুলো দেহের প্রয়োজন অনুসারে সংযোজন, সরবরাহ বা পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। কেননা দেশের সাধারণ মানুষ দুধ-ডিম ও মাংসসহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার কিনতে না পারলেও তারা ভাত নিয়মিত খেতে পারছে। এজন্য জিংক, আয়রন, প্রোটিন, এন্টি-অক্সিডেন্ট, গামা এমাইনো বিউটারিক এসিড (এআইএ) ও প্রো-ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস এবং স্বল্প জিআই সম্পন্ন ডায়বেটিক ধানসহ বিভিন্ন পুষ্টিকর ধান উদ্ভাবন করেছে ব্রি। একটি বিষয় হচ্ছে- দুধের উৎপাদন ১০ গুণ বাড়লেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কেননা তাদের পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য। দেশের সাধারণ মানুষ ৭০ থেকে ৭৫% কার্বোহাইড্রেট এবং ৬০ থেকে ৬৫% প্রাত্যহিক প্রোটিন ভাতের মাধ্যমে পাচ্ছেন। সুতরাং ভাত বর্হিভূত উৎস থেকে আমাদের বাকি ২৫% থেকে ৩০% কার্বোহাইড্রেট এবং ৩৫ থেকে ৪০% প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করার কৌশল ঠিক করতে হবে।

ব্রির পুষ্টিকর ধান গবেষণায় প্রথম সাফল্য আসে ২০১৩ সালে। ব্রির বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সর্বপ্রথম জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত ব্রি ধান ৬২ উদ্ভাবন করেন। মানব শরীরের জন্য জিংক খুব প্রয়োজনীয় একটি খনিজ উপাদান। মানবদেহে ২০০ এরও বেশি এনজাইমের নিঃসরণে অংশ গ্রহণ করে এটি; যেগুলো দেহের অনেক বিপাকীয় কাজে অংশ নেয়। এছাড়া দেহে এন্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, শর্করার ভাঙনে, দেহ কোষের বৃদ্ধিতে এবং পলিপেটাইড, গ্যাসটিন নিঃসরণের মাধ্যমেই স্বাদের অনুভূতি বা রুচি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। জিংক ডিএনএ ও আরএনএ পলিমারেজ এনজাইমের একটি আবশ্যক উপাদান। হাড়ের বৃদ্ধির জন্য কেরাটিন তৈরি ও তার পরিপক্কতা, ত্বকের ক্ষত সারানো, আবরণী কোষের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে মানব শরীরে জিংকের প্রয়োজন হয়। উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের বেড়ে উঠার ব্যাপারে জিংকের অভাব হলে শিশু-কিশোররা বেঁটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু জিংক সমৃদ্ধ জাতের ভাত খেলে শরীরে জিংকের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটে যাবে এবং বেঁটে হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের শরীরে জিংকের দৈনিক চাহিদা ১৫ মিলিগ্রাম এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর দৈনিক চাহিদা ১২ মিলিগ্রাম। ব্রি ধান৬২ তে জিংকের পরিমাণ ১৯ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ মানুষের শরীরে জিংকের যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে তার পুরোটাই মেটাতে পারে ব্রি ধান৬২ জাতের চাল। সাধারণত লাল মাংস, কাঠবাদাম, চিনাবাদাম, সয়া, দুগ্ধজাত খাবার, মাশরুম, যকৃত এবং সূর্যমুখীর বীজ জিংকের চমৎকার উৎস। কিন্তু ভাতের ন্যায় এগুলো সহজলভ্য নয়। পরবর্তীতে ব্রি জিংক সমৃদ্ধ আরো চারটি জাত যেমন- ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৪ এবং ব্রি ধান৮৪ অবমুক্ত করে। এই জাতগুলোর চাল জিংকের চাহিদা মেটাতে আদর্শ হতে পারে।

অনুরূপভাবে, প্রোটিন বা আমিষের অভাবে দেহে সুনির্দিষ্ট অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। শরীরের প্রতিকেজি ওজনের জন্য পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১ গ্রাম, শিশুদের জন্য ২-৩ গ্রাম আমিষের প্রয়োজন। মাছ, মাংস ও ডাল প্রোটিনের অন্যতম উৎস হলেও এসব খাবার ভাতের ন্যায় সহজলভ্য নয়। ব্রি উদ্ভাবিত প্রোটিনসমৃদ্ধ জাতগুলোতে যে পরিমাণ প্রোটিন রয়েছে তা আমাদের প্রোটিনের চাহিদার ৬০ ভাগ পূরণ করতে সক্ষম। যেমন- ব্রি ধান৬২ তে প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৯ ভাগ। ফলে এই ধানটির ভাত মানবদেহে জিংকের পাশাপাশি প্রোটিনের চাহিদা পূরণেও অনন্য ভূমিকা রাখতে পারবে।

গবেষণায় দেখা গেছে যদি ১% প্রোটিনের পরিমাণ চালে বৃদ্ধি করা যায়, তবে মানবশরীরে ৬.৫% বেশি চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। আমাদের পুরনো ধানের জাতগুলোর প্রোটিনের মাত্রা ছিল মাত্র ৮ থেকে ৯%। তবে আমাদের নতুন জাতগুলোর প্রোটিনের পরিমাণ ৯ থেকে ১০%। উদাহরণস্বরূপ- ব্রি ধান৮১ এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৩%, ব্রি ধান৮৬ এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.১%, এবং ব্রি ধান৯৬ এ প্রোটিনের পরিমাণ ১০.৮%। এই জাতগুলো জনপ্রিয় ও সহজলভ্য করা গেলে পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে যে আশঙ্কা তা অনেকাংশেই মোকাবেলা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ১২ থেকে ১৩% প্রোটিন সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করা, যাতে আমরা চাল থেকে প্রতিদিনের প্রোটিন চাহিদার কমপক্ষে ৮০% প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।

আমাদের নতুন জাত ব্রি ধান৮৪ তে আয়রনের পরিমাণ ১০ পিপিএম; আগে ব্রি উদ্ভাবিত জাতগুলোতে আয়রনের পরিমাণ ছিল ৩ থেকে ৫ পিপিএম। ব্রির "হেলদিয়ার রাইস" গবেষণা কর্মসূচির অধীনে এখন ৪৫ পিপিএম জিংক এবং ১৫ পিপিএম আয়রন সমৃদ্ধ দ্বৈত সুবিধার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা; যাতে মানবশরীরের মোট চাহিদার কমপক্ষে ৮০% জিংক এবং ৫০% আয়রনের চাহিদা চালের মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

এছাড়া আমরা জানি ভিটামিন-এ এর ঘাটতি এখনও বাংলাদেশের একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। দেশের প্রি-স্কুল এবং স্কুল-বয়সী শিশুদের ২০% এর বেশি এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫% গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদানকারী মা এই সমস্যায় ভোগেন। অবমুক্তির অপেক্ষায় থাকা ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ধান গোল্ডেন রাইস আমাদের এই সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে। আশা করা যাচ্ছে, গোল্ডেন রাইস অনুমোদিত ও অবমুক্ত হলে ভিটামিন-এ এর চাহিদার ৩০-৫০% পর্যন্ত পূরণ করতে পারবে। কেননা গ্রামাঞ্চলের মানুষ দৈনিক ২-৩ বার ভাত খেয়ে থাকেন।

আগেই বলেছি চালকে প্রধান খাদ্যশস্য বিবেচনায় রাখতে হলে আমাদের কমপক্ষে ৭০ থেকে ৭৫% কার্বোহাইড্রেট বা ক্যালরি চাল থেকে নিতে হবে। তা না হলে ডায়াবেটিক, স্থুলতাসহ বিভিন্ন জীবনাচরিত (লাইফ স্টাইল) রোগ বেড়ে যাবে। সে হিসেবে মাথাপিছু চালের গ্রহণ জনপ্রতি ১৩৪ কেজির নিচে আসা উচিত হবে না।

অথচ ইদানীং দেখা যাচ্ছে, অনেকে ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা থেকে ভাত বাদ দিচ্ছেন। ভাতের পরিবর্তে তারা ফাস্ট ফুডের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন, যা ভাতের তুলনায় আরও বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার।

অনেকে আবার বলে থাকেন নিয়মিত ভাত খেলে লাইফস্টাইল রোগ বাড়ে। এটা আসলে সত্যি নয় বরং আমরা প্রতিনিয়ত বাইরে যেসব স্ট্রিট ফুড বা মুখরোচক খাবার খাই, সেসব খাবারের সঙ্গে ট্রান্স ফ্যাট খাচ্ছি, এগুলোই লাইফস্টাইল রোগের জন্য অনেকখানি দায়ী। এখন আসি এই ট্রান্স ফ্যাট আসলে কী? এটা এক ধরনের ক্ষতিকারক চর্বি, যা তেলে ভাজা খাবারের মচমচে ভাব বাড়ায় এবং খাদ্য বেশি সময় ধরে সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া এই চর্বি খাবারের স্বাদ বাড়ায় এবং টেক্সচার ধরে রাখে। এটি আমাদের দেশে ডালডা বা বনস্পতি হিসেবে অধিক পরিচিত; এর আসল নাম হাইড্রোজিনেটেড অয়েল। অতিরিক্ত ভাজা তেলে ট্রান্স ফ্যাট পাওয়া যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

সাধারণত দুধ ও পশুর মাংসে এই ট্রান্স ফ্যাট পাওয়া যায়, যা ১ শতাংশেরও কম। সুতরাং এটা ক্ষতির কারণ নয়, কিন্তু কৃত্রিমভাবে এ ফ্যাট অসম্পৃক্ত তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেন যোগ করে সম্পৃক্ত করার সময় তৈরি হয়, যা সাধারণ তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে। সাধারণত আমাদের দেশে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চানাচুর, শিঙ্গাড়া, পিঁয়াজু, ফাস্টফুড, ক্র্যাকারস, টোস্ট বিস্কুট ইত্যাদি তৈরিতে এই ট্রান্স ফ্যাট ব্যবহার করা হয়। বেশি পরিমাণ ট্রান্স ফ্যাট আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ নিয়মিত এই ফ্যাটযুক্ত খাবার আমাদের শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) বাড়ায় এবং ভালো কোলেস্টেরলের (এইচডিএল) পরিমাণ কমায়। যার কারণে আমাদের রক্তনালিতে চর্বি জমা হয় এবং স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এই ট্রান্স ফ্যাট রক্তনালির মধ্যে জমে এর সংকোচন পরিমাণ বাড়ায়। এটি করোনারি হার্ট ডিজিজের অন্যতম প্রধান কারণ।

পরিশেষে বলতে চাই, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য গ্রহণে আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে। এ জন্য আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষিত ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোকে এ বিষয়ে জনমত তৈরিতে সচেষ্ট থাকতে হবে। তাহলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সেই জন পুষ্টিস্তর উন্নয়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

লেখক:

উর্ধ্বতন যোগাযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।
ই-মেইল: smmomin80@gmail.com